যে আদর্শকে বেছে নিয়েছো, যার জন্য জীবনপাত করেছ, তার প্রতি আনুগত্য বজায় রাখ। *-শ্রী শ্রী প্রভুজী*

চরণাশ্রিত
লক্ষ্মী চক্রবর্তী
অম্বুজা, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর

ঊর্ধ্বগামী চেতনার বার্তাবহ

উৎসর্পী

বাংলা মাসিক পত্রিকা

সমালোচনা, সংঘাত যা আসছে তাকে আসতে দাও, হাসিমুখে সহ্য করা অভ্যাস কর। *-শ্রী শ্রী প্রভুজী*

চরণাশ্রিত
হেনা চক্রবর্তী
অণ্ডাল, বর্ধমান

শ্রাবণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ | একবিংশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা | মূল্য ৫টাকা | বার্ষিক মূল্য ৫০টাকা | সডাক ৫৫টাকা

Regd. No.- WBBEN/2000/1125 Postal Registration No. P.M.G. (SB)-294/BKU)/RNP-13 Amarkanan BO

প্রভুবাণী

আত্মপ্রাণেষু,

সমাগত সকলকে জানাই সর্বপ্রথম আমার আত্মিক ভালোবাসা ও স্নেহাশীর্বাদ। কামনা করি সর্বোপরি এক শাশ্বত চেতনাশীল জীবনের –যে জীবনে স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই, সংকীর্ণতার বেড়াজাল নেই, সম্প্রদায় নেই, মতবাদ নেই, মন-বুদ্ধি-দেহের অভিমান নেই, গণ্ডি নেই- আছে শুধু চিদানন্দময় জীবনবোধ, আছে আত্মানুভূতির আকুতি, আত্মার আলোকে আলোকিত হবার প্রেরণা এবং বিশ্বজনীন জীবনবোধকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবার এক গভীর অভীপ্সা। এই মহাজীবনের চিন্তন, মনন এবং রূপান্তরই শময়িতা মঠের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই বর্ষ উদ্‌যাপনের আয়োজন। এই আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই আত্মসমীক্ষা। এই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটলে আয়োজন বৃথা, উন্নয়নের পথ রুদ্ধ। উন্নয়ন বলতে -আমি অবশ্যই আত্মিক উন্নয়ন বুঝি। আত্মার প্রসারণ ছাড়া–সামাজিক রাষ্ট্রিক, পারিবারিক কোনো উন্নয়নই স্থায়ী নয়, নৈতিক মূল্যবোধের সহায়ক নয়।

উপলব্ধির বাস্তব রূপায়ণেরই এক অঙ্গ হিসাবে মাতৃজাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শময়িতা মঠ। কিছু সন্ন্যাসিনীকে নতুন কোনো সম্প্রদায়িক চেতনায় আবদ্ধ করে রাখা এ মঠের উদ্দেশ্য নয়, কোনো ব্যক্তিআদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যও নয় এ মঠের প্রতিষ্ঠা। আমি দেখেছি মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতায় সভ্যতার দৈন্য, আমি দেখেছি পৃথিবীব্যাপী মানবিকতার ক্লিষ্টতা, আমি শুনেছি রিক্তা জননীর আর্তি আর দীর্ঘশ্বাস। আবার আদর্শ মাতৃমূর্তিকেও আমি দর্শন করেছি, তার জাগ্রত অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেছি আমার শিরায়, শিরায়। সমাজের বুকে সেই পূর্ণ মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, সেই আদর্শ মাতা, জায়া ও কন্যার জন্মদান করবে 'শময়িতা মঠ,' এতেই তার সার্থকতা।

তাঁরই ভাবনায়

জীবনে কোনো ঘটনাই নিরর্থক নয়

পরমারাধ্য প্রভুজীর ঈশ্বরীয় সান্নিধ্য আমাদের মধ্যে নিত্য অনুপ্রেরণা দেয় জীবনের বাস্তবতাকে শিক্ষণীয়রূপে গ্রহণ করার। তিনি ভাগ্যের বিড়ম্বনাতে মূহ্যমান হওয়াকেও স্বীকার করে না, আবার উদাসীনতায় কর্তব্যের অবহেলাকেও প্রশ্রয় দেন না। কারণ একদিকে যে ঘটন অঘটন পটিয়সী মহামায়ার নিত্য পটপরিবর্তন হয়েই চলেছে, সেই পরিবর্তনতার সাথে প্রতিমুহূর্তে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া অনেক সময়তেই দুরূহ হয়ে যায়। এ যেন জীবনের একটা অভিশাপ। সুস্থ সাবলীলতার মধ্যেও হঠাৎ করে বিপর্যয়ের সূচনা জীবনকে আগাগোড়া পাল্টে দিয়ে বিপর্যস্ত করে তোলে। ফলে আকস্মিক ঘটনার বেসামাল জীবনতরীর দিগভ্রান্ত হওয়ার ঘটনা কিছু কম ঘটে না। চেতনাশীল জীবনের কাছে এই ঘটনার আঘাত বেশ বড় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যে সম্ভাবনা নিয়ে তার পথচলা শুরু হয়েছিল তাতে বাধা আসে। এখানে বাধা মানে তার চেতনার বিকাশের বাধা। ক্রমাগত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে আত্মগ্লানির বশীভূত হয়ে যাওয়া। আত্মগ্লানি তো মানুষকে সংকুচিত করে কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

এই ব্যস্ততার মধ্যে একবার পড়ে গেলে উঠে আসাই কঠিন। তাই সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা থাকবে এমন মানসিকতা গড়ার যেখানে জলে ভিজলেও গা ভিজবে না। কিন্তু কি সেই জিনিস যা ভেজায় না। আসলে তা হল ইষ্টানুরাগ। এ অনুরাগ অবশ্যই দুর্লভ। কারণ জীবন জিজ্ঞাসু প্রবণতা যদি যথার্থ জ্ঞানউন্মেষক হয় তাহলেই বৈরাগ্য অধ্যুষিত মননের মধ্যে দিয়ে সেই কৃপা প্রাপ্তির ক্ষেত্র তৈরি হয়। তাতেই বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চিত হতে থাকে ইষ্টানুরাগের মধুময়তা। তাই প্রভুজী আমাদের অনুপ্রেরণা দেন, সংশোধন করে দেন, বিভ্রান্তি দূর করে শুধুমাত্র সরল ভালোবাসার ব্যঞ্জনায়। ইষ্টের প্রতি নির্ভরতা বাড়াতে বলেন। তিনি বলেন, এই নির্ভরতার মাত্রা যতই বাড়বে ততই প্রগাঢ় হবে অন্তর্শক্তি। এই অন্তর্শক্তির আস্বাদ বৃদ্ধি পেলেই স্বাবলম্বী সত্তা আস্তে আস্তে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে শেখে। তার আগে বার বার শুধু দুর্বলতার আঘাতে ম্রিয়মান হয়ে থাকা। আসলে মূল কথা হল ব্যক্তিগত ভাবনার জগৎ হতে বেরিয়ে আসা। তাই তো অধ্যাত্মপথিকের আত্মিক নিবেদনে শুধু প্রার্থনা,– 'আমাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে করো হে তোমার তরী'। পরমারাধ্য প্রভুজী এখানেই বলেন, আমাদের সংকল্প হবে বিশ্বপিতার সংকল্প। অর্থাৎ ঘটনার ঘনঘটায় বিচলিত না হয়ে শরণাগত থাকার মানসিক স্থিরতা রাখা। এটাই ব্যক্তিজীবনের পূজা, এটাই জীবনের সুন্দরতা বজায় রাখার একমাত্র উপায়। প্রভুজী বলেন, মানুষ চায় তিনি তার মতন হয়ে আসুন কিন্তু তুমি তাঁর মতন হয়ে যদি আসতে পারো তবে দেখবে আরো আনন্দ, আরো শান্তি। কিন্তু এই পরিবর্তন অর্থাৎ এই যে আমি'র চাহিদা হতে তোমার চাহিদাকে বুঝতে পারা ও জীবনে তা বাস্তব করে দেখানো একেই বলে জীবন-উত্তরণ। যতক্ষণ না পর্যন্ত হয়ে উঠতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত এই পথ চলারও বিরাম নেই। আর প্রাপ্তির পর বোঝা যাবে যাঁকে খুঁজতে এতদূর এসেছি সেই তিনি তো নিত্য সাহচর্যেই আমাদের অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন। তাই ঘটনাতে ভয় না পেয়ে তিনি যে নিত্য আছেন পাশে তাকে অনুভব করতে পারার প্রত্যয়কে তৈরি করাই আসল কথা। শুধু মাত্র মুখের কথাতে নয় জীবনের প্রতিটি পর্যায়কে ঈশ্বরের ইচ্ছায় উৎসর্গীকৃত করার নামই নিবেদন। নিবেদনের এই সুস্থিরতাতেই অধ্যাত্মপথিক দেখতে পায় তার জীবনের প্রতিটি পদেই আছে মহানতার পদধ্বনি। তার বোধে একটার পর একটা সিঁড়িকে একা ধাপে ধাপে অতিক্রম করতে পারলেই স্বাভাবিকভাবেই উচ্চতর বোধে উন্নীত হওয়ার অনুপ্রেরণা আসে। আসে বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার উদারতা, আসে বৃহতের আঙিনায় নিজেকে মেলে ধরার প্রত্যয়। তাই গ্রহণের আস্পৃহাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য আমরা বৃহতের শরণাপন্ন হয়ে তাঁরই ভাবনায় চিন্তায় নিজেকে গড়ে তোলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হই। এই অঙ্গীকার আমাদের জীবনের অঙ্গীকার, পূজা তাই জীবন, পূজারই নামান্তর। কারণ পূজার আনন্দই হল বৃহতের আনন্দ অনুভব। নিজেকে হারিয়ে সব পাওয়ার আনন্দ। এক অনন্ত বিশ্বাস আর ভালোবাসায় দৃঢ়তার সাথে একপা-একপা করে এগিয়ে যাওয়া। অন্তর পরিবর্তনের এ আয়োজনে শুধু নিঃশেষে আহুতি নিবেদন। তাই আমি কি চেয়েছিলাম আর কি পেতে চাই তাই নিয়ে আর কোনোই উদ্বিগ্নতার সুযোগই থাকে না। পরমারাধ্য প্রভুজী তাই অধ্যাত্মপথিককে ডাক দিয়ে বলেন, "যা আসছে তাকে আসতে দাও। প্রভুর প্রতি পূর্ণ আস্থা নিয়ে জেনো যা আসছে তা কোনোটাই নিরর্থক নয়।"

আমাদের প্রত্যয়ী ভালোবাসাই তৈরি করে যে আশাবাদী মনকে তা-ই আমাদের সেই অন্তর্দৃষ্টি দেয়। যে দৃষ্টিতে বৃহতের আঙিনায় নিজেদের ছোট ছোট চাওয়াপাওয়াগুলো সব হারিয়ে গিয়ে এক সাবলীল সুন্দরের রূপ ফুটে ওঠে। বুঝতে পারা যায় আজকের সমস্যার ভারবহতায় আছে কোনো অনাগত ভবিতব্যের উত্তরণের শক্তি। পরমারাধ্য প্রভুর প্রতি পূর্ণ আস্থাই তাই আমাদের একমাত্র সহায়।

–সাগ্নিকা

পূর্ণই অপূর্ণতায় নিজেকে ঢেকে এগিয়ে চলেন পূর্ণতার দিকে। তাই বাইরের কর্ম–কোলাহলে নিজেকে বিস্মৃত না হয়ে সর্বদাই সজাগ থেকো স্বরূপ চেতনায়। *-শ্রী শ্রী প্রভুজী*

চরণাশ্রিত
মৈনাক সরকার
শিলিগুড়ি

আমি জেনেছি মানুষের চরম সত্যকে, সেই সত্যকে সামনে রেখেই সবার সাথে আমার পরিচয়। তাই আমি আশা করব, একটি শাশ্বত জীবন, একটি শাশ্বত প্রাণ। *-শ্রী শ্রী প্রভুজী*

চরণাশ্রিতা
শীলা ব্যানার্জী
দুর্গাপুর

ইন্দ্রিয়ের বাস মনে। তাই মনকে সর্বাগ্রে গড়ে তুলতে হবে আত্মমুখী। তাঁরই ভাবনায়, তাঁরই চেতনায় আমাদের প্রতিটি সমস্যার সমাধান হবেই। *-শ্রী শ্রী প্রভুজী*

চরণাশ্রিত
শঙ্কর লীলাহ
ব্যাঙ্গালোর

সম্পাদকীয়

আমার মাথা নত করে দাও

আমরা আমাদের সমস্ত জীবন এমনভাবে যাপন করতে চাই যাতে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা যায় সুষ্ঠভাবে। তাই এর আয়োজনে সচেষ্ট থাকি অবশ্যই। কারণ এ হল আমার ব্যক্তি-স্বাভিমান ও ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি। তাই মাথা উঁচু করে জীবন যাপন করার জন্যই চলে তার সারা জীবনের সংগ্রাম। আর এই জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্যই চাই রূপায়ণের শক্তি । সেই শক্তির একমাত্র উৎস সেই পরম ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তার কাছেই নিত্য নিরন্তর প্রার্থনা করে মানুষ। মানুষের মনুষ্যত্বের জ্ঞান হওয়া অবধি সারা জীবনের সাধনা শুধু যেন লীন হয়েই থাকে সেই পরমের কাছে যাতে করে নিঃশেষে প্রতিমুহূর্তে হৃদয়সর্বস্ব ধন উজাড় করে দিয়ে যাওয়ার পরম আয়োজন। সে চায় সব কিছুর মাঝে সেই সত্যময়ের শ্রীচরণতলেই এ ব্যক্তিসত্তা যেন লীন হয়েই থাকে। সচেতন মানুষ তার জীবনের এই নিশ্চয়তাকে রূপায়ণের জন্যই আবার আপন ইষ্টের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করে, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণতলে।

অধ্যাত্ম তত্ত্ব বড়ই নিগূঢ়। বুদ্ধির প্রসারণ তাঁর কৃপা না হলে হয় না। তাই দ্বন্দ্ব আর সংশয় পদে পদে মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। সব কথার গ্রহণীয়তা হৃদয় দিয়ে না হলে তার বাস্তব প্রয়োগও হয় না। সাধারণত মাথা নত বলতে আমরা ধারণা করি ব্যক্তিগত দুর্বলতার। উন্নাসিক আমিত্ব তাই ভাবে ঈশ্বররাজ্যে শুধু দুর্বলতার জয়গান। যার যা মনোগত বাসনা আছে অথচ তার উদ্যম নেই কায়েম করার তারাই মানত করে, প্রার্থনা করে, পুজো দিয়ে উপঢৌকন উপহার দিয়ে কোনোরকমে চায় নিজের ইচ্ছার পূরণ। সেই ইচ্ছা যে নেহাতই ব্যক্তিগত। তাই বৃহতের কাছে বৃহতের রূপায়ণের প্রার্থনা না রেখে এই যে সীমিত হয়ে থাকছি এটাই তো অপরাধ। এই অপরাধেই আমাদের দুর্ভোগ হচ্ছে, কষ্ট আমরাই পাচ্ছি। তাই যে অনন্য বিচারবুদ্ধি আমরা এই মনুষ্যজীবনের উপহারস্বরূপ পেয়েছি তাতে আমাদের আন্তরিকভাবে মুক্তি দেবে। নিজেকে সেই বৃহতের অংশ বলে মনে করে নিজেকে স্বভাবের সদ্ অর্থে ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারিক কৌশল থেকেই বুঝতে পারা যায় ব্যক্তিসত্তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি কী ধরণের হচ্ছে। কারণ বুদ্ধিই পারে বিপথে চলা ইন্দ্রিয়জ আবেগকে প্রতিরোধ করতে। এই যে প্রতিরোধ গড়া এই যে নতুনভাবে চালনা করা এ সবের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মাথা নত হওয়া। বৃহতের চরণে ভূমাবোধের জাগরণে আমাদের মাথা নত হলেই আমাদের ইন্দ্রিয় তাড়না আমাদের জড়তা হতে মুক্তি দেবে। আমরা নিজেকে সেই বৃহতের অংশ বলে মনে করে নিজের স্বভাবের প্রতিফলন ঘটাই নিজেদের সংস্কার ঘটাই। এই সংস্কারের প্রচেষ্টাই মূলত জীবনসাধনা। তাতে এক একজনের এক একরকমের পরিমার্জনা হতেই পারে। কারণ ব্যক্তিগত সংস্কারের কারোর একটা দিক আছে তো কারোর আরেকটা দিক। তাই আদর্শপুরুষের উপস্থিতি এবং নির্দেশিকা জীবন গঠনে একান্ত প্রয়োজন। তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ এক একজনকে সময় মতো দিয়ে চলেন। কিন্তু এই মাথা নত করে নেওয়ার মানসিকতা না থাকলে তাহলে নিরাময় হয়ে পরিশুদ্ধ হওয়ার প্রবণতাও কমতে থাকে।

তাই আনুগত্যের নিষ্ঠা অধ্যাত্মব্রতীর অন্যতম অলঙ্কার। আনুগত্যে কমতি থাকলে আমিত্বের ছোট ছোট ঢেউগুলো ক্রমাগত মাথা তুলতে থাকে আর তাতে করে অহেতুক অভিমানী হিয়ার বিড়ম্বনার হাত হতে নিস্তার পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাই প্রগতির পথও রুদ্ধ হতে থাকে। ধোঁয়াসা তৈরি হয় ধর্মীয় ভাবনার ব্যঞ্জনাকে কেন্দ্র করে। তাই কোথাও ধর্মকে আফিং মনে করে ধর্ম হতে দূরে পালানোতেই বীরত্ব ভাবা হয়, তো কোথাও ধর্মক্ষেত্র দুর্বলদের জায়গা বলে কৌতুক করা হয়। পরমারাধ্য প্রভুজী তাই তাঁর জীবনসাধন পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, "আত্মনিবেদন নয় কোনো দুর্বলতা। পুরুষকারের চরমলব্ধ জ্ঞানই হল প্রেম। জ্ঞান ভক্তির সাম্যরসে সাধক যখন উপলব্ধি করেন তার আপন সত্তা তখন আপনা হতেই আত্মনিবেদনে সব কিছু শান্ত, নির্বাক হয়ে ওঠে।"

পরম ইষ্টের পাদপদ্মে মাথা যত নত করতে পারা যায় ততই কিন্তু উন্নত হয় ব্যক্তিত্বের শির এই মানুষের সংসারে। আমরা আদর্শের কাছে নত হলেই উন্নত বোধের ধারক হব, উন্নত কর্মের পথিকৃত হব আর উন্নত স্বতন্ত্র জীবনীশক্তির অধিকারী হতে পারবো।

শময়িতা মঠের প্রতিষ্ঠা ভাবনায়

গাঢ় রাত্রির অন্ধকারের মাঝে সযতনে লুকানো থাকে নতুন প্রভাতের অনিবার্য প্রতিশ্রুতি। অন্ধকারের পরেই যে আলোর প্রকাশ। ঠিক তেমনই হাজারও বিক্ষুব্ধ সামাজিক জীবন জটিলতার কুজ্ঝটিকা যুগ চেতনাকে ধূমায়িত করে মানবসমাজের অস্তিত্বকে যখন বিপন্ন করে তোলে তখনই নিভৃত নিরালায় কাজ করে চলে ঈশ্বরীয় প্রতিশ্রুতি। তাই তো বিয়োগান্ত পরিস্থিতির সমস্ত হতাশার মাঝেও দেখা যায় নতুন প্রভাতের প্রতি সাগ্রহে ভারাক্রান্ত পৃথিবীও তাকিয়ে থাকে। সৃষ্টি রক্ষায় যে পরম স্রষ্টা বদ্ধপরিকর। কখন বিশ্বপিতার বহ্নিপ্রকাশ ঘটবে তা কেউ জানে না। শুধু সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে মহাস্রোত।

পরমারাধ্য প্রভুজীর ভাবনায় তাই শুনি, "নতুন জগৎ সৃষ্টি হবে নতুন ভিত্তির উপর। আধুনিক জগৎ চলছে বহিরঙ্গের উপর। বাইরের চাকচিক্যময় উপাদানের উপর। নতুন জগৎ শুরু হবে অন্তরাত্মা থেকে। জ্যোতির্ময় ভাগবৎ সত্তা থেকে।"

পরম প্রভুর দিব্য ভাবনার রূপায়ণের ভাগবতী শক্তিকে নির্ভর করেই শময়িতা মঠের গড়ে ওঠা। আজ শময়িতা মঠের ২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯৯৬ সালের ঠিক এমনই এক স্বাধীনতা দিবসের বৃষ্টিস্নাত শ্রাবণী প্রভাতে আত্মপ্রকাশ করেছিল শময়িতা মঠ। বিশ্বপিতার সুবিশাল কর্মযজ্ঞের এক সমিধ হয়ে শময়িতা মঠকে বিশ্বের অঙ্গনে স্বাধীন পদচারণা করার ঐশী স্বীকৃতি দিলেন পরমারাধ্য প্রভুজী। তাই আদর্শ সেবিকা রূপেই শময়িতা মঠের সার্বজনীন স্বীকৃতি। মহাযোগীর সাধনগম্ভীরায় প্রস্ফুটিত হয় শময়িতা মাতার জীবন্ত প্রতিভাস। শময়িতা মঠ বিশ্বাদর্শ রূপায়ণের এক বেদীপীঠ। বিশ্বপিতার সংকল্পে তাই দেখি জীবন হতে জীবনান্তরে এই সুমহান ভাবনার দৈব প্রেরণা পৌঁছে দেওয়ার তাগিদ। প্রতিটি জীবনের পরম আদর্শ নিরূপণ করে তার প্রতি আনুগত্যে জীবন পরিচালিত হোক আত্মনিবেদনের দৃঢ়তায়। তাই শময়িতা মঠের জন্মলগ্নেই পরমারাধ্য প্রভুজী বললেন, "নতুন কোনো সাম্প্রদায়িক চেতনায় আবদ্ধ করে রাখা এ মঠের উদ্দেশ্য নয়, কোনো ব্যক্তি আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যও নয় এ মঠের প্রতিষ্ঠা। ..শময়িতা মঠের গবেষণাগার হল এই বিরাটের জাগরণের কেন্দ্র। এই জাগরণী মন্ত্র দিয়ে গড়ে তুলতে হবে গ্রামে, শহরে, নগরে মাতৃসংগঠন। ফিরিয়ে আনতে হবে শিক্ষার সঙ্গে শাশ্বত চেতনাবোধ– নারীর স্বকীয় মর্যাদা, মৌলিক অধিকার আর প্রতিষ্ঠা করতে হবে ধর্মকে। এ কোনো হেঁয়ালী কথা নয়, কুহেলী স্বপ্ন নয়, এ হল শময়িতা মঠের দিব্য অঙ্গীকার।"

শময়িতা মঠের প্রসারিত হৃদয় আহ্বান করে এই পৃথিবীর প্রতিটি চেতনান্বিত প্রাণকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদকে তুচ্ছ করে তাঁর আহ্বান তাই দেশকাল পরিবেশে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত প্রাণকে। জীবনকে পর্যালোচনার জন্য চাই জীবনজিজ্ঞাসু মনোভাবের তীব্রতা। আর তা জীবনের যে কোনো পর্যায়ে দাঁড়িয়েই সম্ভব। প্রভুজী বলেন, "যে যেখানে আছো, সেখান হতে এগিয়ে চলার সাহস নাও। বাস্তব হতে নির্বাসন নয়। বাস্তবের পরিবর্তনতার মাঝে দাঁড়িয়েই গড়তে হবে এক নতুন জীবন।" জীবনধর্ম তাই তার বাস্তবায়নেই স্বীকৃত।

ধর্ম কোনো আচার-অনুষ্ঠান নয়। আত্মানুভূতির গভীরতম স্তর হতে সঞ্চিত আত্মশক্তিতেই উপলব্ধ হয় উপনিষদের সেই পরম বাণী, 'আমি দেহ নই আমি আত্মা'। সেই উপলব্ধিই জীবনের পরম প্রাপ্তি। আমাদের জীবনযাত্রা এ লক্ষ্যাভিমুখেই নির্ধারিত হয়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে মনন ও পর্যালোচনাই ধর্ম। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মীয় নামের সীমায়ণে থেকে গেলে প্রকৃত ধর্মাচরণের প্রাপ্তি অধরাই থেকে যাচ্ছে। তাই যে কোনো ধর্মের অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই পৌঁছাতে হবে সেই আত্মানুভূতির রাজ্যে। কারণ এখানেই জীবনের সত্য, জীবনের ধর্মের সত্য। যে কোনো ধর্মের সত্যতা এখানেই নিহিত। তাই শময়িতা মঠ প্রভু ভাবনায় বিশ্বাস করে মানুষ এক, ধর্ম এক,ঈশ্বর এক। ধর্মান্তকরণ বাতুলতা। মানুষ ঠকনোর জালিয়াতি। এখানেই শময়িতা মঠ তার তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

শময়িতা মঠ তার জন্মলগ্নে মাতৃসংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করলেও ধীরে ধীরে তার মাতৃহৃদয়ে উৎসারিত হয় এক সার্বজনীন আহ্বান, আত্মার রাজ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই। শময়িতা মঠে সকলের আনন্দযজ্ঞে ঘটে সকলের সমাবেশ। আত্মজাগরণে আত্মমুক্তির বার্তা শোনায় শময়িতা মঠ। অনুকম্পাজনিত দুর্বল নারীদের আশ্রয় দেওয়া নয় বরং এ সমাজের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিপীড়িতা দুর্বল শ্রেণীর সে হবে সহায়িকা শক্তি। একাধারে সুবিশাল কর্মকাণ্ড,অন্যদিকে তার জীবনদর্শনের রত্নময় আকর নিয়ে সমাজের বরাভয়া মাতৃহৃদয় রূপা শময়িতা মঠ যুগপুরষের শাশ্বতী শক্তির উন্মেষিকা হয়েই পৃথিবীতে তার সেবাব্রত নির্বাহ করে যেতে চায়।

মঠ সংবাদ

খরিফ চাষের জন্য ৭০০০ কৃষক পেলেন উন্নত ধানবীজ

করোনা–আবহে জনমানসে রোগের আতঙ্ক ক্রমে তীব্র হচ্ছে, প্রতিদিন সংক্রমণ বাড়ছে। আমাদের দেশ এবং রাজ্যও বিপন্ন। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘ লকডাউনের পর আনলকপর্বের পাশাপাশি শুরু হয়েছে আংশিক লকডাউন। বহু মানুষ কর্মহীন। আপাতত সরকারি রেশনব্যবস্থায় কিছুটা হলেও চাল পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তায় অনেকেই দিশেহারা, বিশেষত গ্রামের প্রান্তিক মানুষ। কীভাবে চলবে ? অর্থের চিন্তা, খাবারের চিন্তা।

প্রান্তিক মানুষের ভবিষ্যৎ অন্নচিন্তা দূর করতে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও উদ্যোগী হয়েছে শময়িতা মঠ। এবিষয়ে প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বেয়ারস্ গ্লোবাল ইনিসিয়েটিভ (Bayer's Global Initiative).

শময়িতা মঠ বেশ কিছু দিন ধরেই বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি এবং ঝাড়গ্রাম এলাকার বিভিন্ন গ্রামে কৃষক পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে। উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে বেশি ফসল ফলানো যায়, কৃষকদের প্রশিক্ষণ, আধুনিক বীজ সরবরাহ, উন্নত কৃষি সম্পর্কে সচেতন করা, কৃষিজ ফসল বাজারজাত করা–সবরকমভাবে পাশে থাকার চেষ্টা করেন শময়িতা কৃষিকেন্দ্রের দক্ষ প্রশিক্ষিত কর্মীবৃন্দ। গত কয়েকবছর ধরে গ্রামের প্রান্তিক কৃষকরা নানাভাবে উপকৃতও হয়েছেন।

দীর্ঘ লকডাউনের প্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ে খরিফ মরশুমের চাষে তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। স্থানীয় কৃষকরা বিভ্রান্ত হতাশ। দূর প্রবাসের কর্মস্থল থেকে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসেছেন বহু পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁরাও কর্মহীন। বেয়ারস্–এর সহযোগিতায় শময়িতা মঠ স্থানীয় কৃষকদের যেমন উৎসাহিত করেছে, তেমনি কর্মহীন পরিযায়ী শ্রমিকদেরও কৃষিকাজে নিয়োজিত হতে সবরকমের চেষ্টা করেছে। বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের মোট ৭০০০ কৃষককে উন্নত প্রজাতির ধানবীজ ও বীজ শোধনের জন্য ফাংগিসাইড দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করতে প্রত্যেককে একটি করে মাস্ক দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের শ্লোগান হল 'উন্নত কৃষি উন্নত জীবন' (Better Farms, Better Lives)।

ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম ব্লকের ৮টি পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামের ৩৮০০ কৃষককে এক বিঘা ধান চাষের জন্য ৩কেজি ধানবীজ দেওয়া হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা–১ ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের, গড়বেতা–২ ব্লকের ৯টি গ্রামপঞ্চায়েতের এবং শালবনি ব্লকের ২টি গ্রামপঞ্চায়েতের মোট ২৫০০ কৃষককেও উন্নত ধানবীজ (এইচ আর ১১৮০ প্রগতি), বীজশোধক ও ফাংগিসাইড দেওয়া হয়। বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের ৭০০ কৃষককেও এইরকমভাবে উন্নত ধানবীজ, বীজশোধক, ফাংগিসাইড ও মাস্ক দেওয়া হয়।

বেয়ার (Bayer)এর সহয়োগিতায় শময়িতা মঠ তিনটি জেলার মোট ৭০০০ কৃষক ও পরিযায়ী শ্রমিককে খরিফ চাষে উৎসাহিত করতে পেরে গর্বিত। প্রয়োজনের তুলনায় এ উদ্যোগ হয়তো যথেষ্ট নয়। তবে সহমর্মী সকল শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতায় আগামীদিনে আরও বেশি মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে চায় শময়িতা মঠ। এই সেবাকর্মে যুক্ত মঠের সকল কর্মীকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

চাই পারস্পরিক সামাজিক বন্ধন

উজ্জ্বল ভট্টাচার্য

''মানুষ বড়ো একলা
তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও...''।

যদিও আমরা সমাজবদ্ধ জীব বলে নিজেদের মনে করি। সামাজিকতার প্রথম অনুশাসন হলো পারস্পরিক সহযোগিতা। সহযোগিতা মানে কিন্তু ক্রয়–বিক্রয় নয়। সম্প্রতি এই করোনা সমস্যাকালীন সময়ে সোশ্যাল মেসেজিংয়ে একটা মেসেজ পেলাম। একটি রাঘববোয়াল স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা তাদের হোম কোয়ারেন্টাইন প্যাকেজের বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছে। রোগী বাড়িতেই থাকবে। তারা রোগীকে সপ্তাহের সাত দিন ডাক্তারের সঙ্গে টেলিকনফারেন্সের সুযোগ দেবে। দরকার পড়লে আপৎকালীন অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেবে, ব্র্যাকেটে লেখা ফ্রিতে। যদিও টাকা নেওয়ার পরও কী করে ফ্রি পরিষেবা কথাটা আসে আমার বোধগম্য হয় না। এটাই অবশ্য এখনকার ব্যবসার টেকনিক। লোককে ভুল বোঝাও, লোককে কনফিউজড করে দাও। তার সঙ্গে কিছু মাস্ক, কিছু স্যানিটাইজার, কিছু পিপিই কীট, একটা স্পাইরোমিটার, একটা পালসো–মিটার এরকম আরো কিছু দ্রব্য। প্রয়োজন থাক বা না–থাক তোমার বাড়িতে যেগুলো জমা করে তোমাকে নিশ্চিন্ত করা হবে যদি কখনো দরকার পড়ে তুমি এগুলো ব্যবহার করতে পারো। সবাই টাকাটা দিয়ে খুব নিশ্চিন্ত বোধ করবে, আমার যদি কোনো অসুবিধা হয় আমার পেছনে একটা বড় সংস্থা সাহায্যের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সবাই জানি যে আমাদের এত বিশাল জনসংখ্যাপূর্ণ দেশে যেকোনো সরকারি পরিষেবা খুবই নগণ্য। যার ফলে সবক্ষেত্রেই বেসরকারি পরিষেবার রমরমা। সাধারণভাবে যারা অর্থনৈতিকভাবে সব থেকে পিছিয়ে পড়া তারা বাধ্য হয় সরকারি পরিষেবা গ্রহণের জন্য বিশাল ভিড় করে লাইন দিতে। স্বাভাবিকভাবেই যারা অর্থনৈতিকভাবে একটু ক্ষমতাবান তারা সেই ভিড়ে নিজেদের স্থাপনার কথা চিন্তাই করতে পারে না। প্রথমত সময়, এতটা সময় দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে! দ্বিতীয়ত স্ব আরোপিত মান–সম্মান, ওই প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে একই লাইনে দাঁড়াবো ! মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের এই মনোভাবের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থারা। পয়সার বিনিময়ে তারা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। হ্যাঁ এই কথাটা আমিও মানি যে সম্পূর্ণ চ্যারিটি করে কোনো জিনিস বেশি দিন টিকিয়ে রাখা যায় না। এবং এখনকার সামাজিক ব্যবস্থায় কোনো চ্যারিটি মানেই তার পিছনে একটি অন্ধকার অংশ থাকবেই। নিঃস্বার্থভাবে কেউ কিছু করছে এটা যেমন দেখাও যায় না ও তেমন বিশ্বাসও করা যায় না। কিন্তু অদ্ভুতভাবে আমাদের মধ্যেই এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা সত্যি নিঃস্বার্থভাবে অপরের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই যেহেতু আমজনতা, সোনু কিংবা অক্ষয়কুমার নন এবং তারা নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে ক্ষুদ্র অংশে কাজ করেন, তাই তাদের কাজটা খুব কমই আলোকিত হয়, উচ্চারিত হয়। সত্যি কথা বলতে কি এদের আলোকিত হওয়ার ইচ্ছাটাও মনে হয় থাকে না। সোশ্যাল মিডিয়াতে এমনও দেখেছি কোনো দুস্থ মানুষকে চারশো গ্রাম প্যাকেট দিচ্ছেন চল্লিশ জন স্বেচ্ছাসেবী, এই ছবি তুলে পোস্ট করা হয়েছে। পয়সার বিনিময়ে যারা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, সেখানে দাম নির্ধারণ করার ক্ষমতাও সেই পরিষেবা–প্রদানকারী সংস্থারই অধিকারে । যাকে অর্থনীতির ভাষায় বলে সেলার্স মার্কেট। মানুষকে যত ভয় পাওয়ানো যাবে, তার চাহিদা যত বাড়ানো যাবে তত সেলার্স মার্কেট শক্তিশালী হবে। সত্যিকারের সেই প্রয়োজনটা আছে কিনা এই বোধটাই তখন লুপ্ত হয়ে যাবে। যার ফলে অনেক অনেক বেশি দামে সেই পরিষেবা কিনতে আমরা বাধ্য থাকব। আগে যেখানে কোনো বস্তুর গুণের মানের ওপর নির্ভর করে তার ক্রয়–বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত হতো। যতদিন যাচ্ছে এখন এই সমাজব্যবস্থায় সবকিছুর গুণমান এমন নির্ধারিত হচ্ছে তার ক্রয়–বিক্রয় মূল্যের ট্যাগ –এর উপর ভিত্তি করে। এটার বেশি দাম, তাহলে জিনিসটা নিশ্চয়ই ভালো। আগে ব্যবসা মানে ছিল কোনকিছু পরিষেবা দেওয়ার বিনিময়ে কিছু অর্থপ্রাপ্তি। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিষেবার মান কতটা কম দিয়ে ব্যবসায় লাভ করা যায়। অথবা ক্রেতাকে ভুল বুঝিয়ে বোকা বানিয়ে কত বেশি অর্থপ্রাপ্তি করা যায়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিশ্বাসের জায়গাটা খুব নড়বড়ে করে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি একটি সোশ্যাল মেসেজিং গ্রুপের এডমিন এই করোনাকালীন পরিস্থিতিতে জানালেন, ''আপনারা কেমন আছেন? যদি কারোর কোনো অসুবিধে হয় আমাদের এই গ্রুপে জানাতে দ্বিধা করবেন না। এখানে আমাদের কিছু ডাক্তার বন্ধু আছেন, তাছাড়া গ্রুপে কিছু ভলেন্টিয়ার আছেন যারা প্রয়োজনমতো আপনাদের সাহায্য করতে পারে।'' এই ভাবেই পারস্পরিক সামাজিক বন্ধন গড়ে ওঠে যা মুদ্রার বিনিময় কখনোই সম্ভব নয়।

মানুষী বুদ্ধি দিয়ে তোমার দেবত্বকে ম্লান কোর না। তুমি অনন্ত শক্তির প্রকাশ। তোমার মাঝেই রয়েছে বিশ্বপিতার চির আশীর্বাদ।
-- শ্রী শ্রী প্রভুজী

চরণাশ্রিত
অঞ্জলি মুখার্জী
কলকাতা

সত্যের পরীক্ষা–নিরীক্ষাই জীবন। সে জীবনই পারে সমাজে, রাষ্ট্রে, সারা বিশ্বে একটা দাগ রেখে যেতে, কিছু সৃষ্টি করে যেতে।
-- শ্রী শ্রী প্রভুজী

চরণাশ্রিত
প্রণীতা নন্দী
সগরভাঙা, দুর্গাপুর

সততার সঙ্গে আন্তরিক উপলব্ধি হবে কর্মের প্রেরণা। ত্যাগের বিনিময়ে শিবসেবাই হল কর্মযোগীর আদর্শ।
-- শ্রী শ্রী প্রভুজী

চরণাশ্রিত
আত্রেয়ী চ্যাটার্জী
টোকিও, জাপান

শ্রাবণের ধারার মতো

মণীষা সরকার

আমরা যখন দুঃখ বা কষ্ট পাই তখন না জেনে না বুঝে অভ্যাসবশত বলে থাকি – এ সবই আমার পূর্বজন্মের কর্মফল। যাকে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয় সংস্কার। পরম আচার্যদেব প্রভুজী বলেন, সব আগে থেকে ঠিক করে রাখা ছিল। তাই মানুষের জীবনধারাও নির্ধারিত। কেউ হয়তো সংসারের মধ্যেই ডুবে থাকে, আবার কেউ সংসারে সব পেয়েও কিছুতেই সুখী হতে পারে না। কিছু একটা খুঁজে বেড়ায়, হয়তো ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। ঈশ্বরমুখী হবার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে, ভক্তির স্ফূরণ হলে পথপ্রদর্শকের দেখা মেলে। ঈশ্বর যেন এই শুভক্ষণটির জন্যই অপেক্ষা করে থাকেন। তবে কিনা ভক্তের প্রকার ভেদ আছে। শ্রীমদভাগবৎ গীতায় কৃষ্ণজী বলছেন,

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

যারা অর্থার্থি তারা সুখ ও সম্পদের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে,যারা আর্ত তারা রোগ-যন্ত্রণা উপসমের জন্য ঈশ্বরের ভজনা করে, যারা জিজ্ঞাসু তারা ধর্মীয় তত্ত্ব জানার জন্য সাধনা করে আর যারা জ্ঞানী তারা ঈশ্বরকে ভালোবেসে ঈশ্বরকে পাবার জন্য আরাধনা করে। প্রভুজী বলেন, প্রত্যেকেই তার নিজস্বকর্ম ও সঞ্চিত ফল নিয়ে এ পৃথিবীতে আসছে। ঈশ্বর ভক্তকে কখনও নিরাশ করেন না, তিনি ভক্তের চাহিদা অনুযায়ী ফল দান করেন। তবে ঈশ্বরের একান্ত ভক্ত যে শুধু তাঁকেই নিষ্কামভাবে, নিখাদ প্রেমে পেতে চায়। তিনিও ভালোবাসায় তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। মানুষকে দেন ঈশ্বরীয় পথের প্রেরণা। পথ যতই দুর্গম হোক আচার্যের প্রতি অবিচল অটল, বিশ্বাস আর ভালোবাসায় হাত শক্ত করে ধরে থাকলে পিছিয়ে পড়ার ভয় থাকে না। তিনি বলেন, সব আছে নিজের মধ্যে, বাইরে থেকে কিছু আসবে না। নিজের মধ্যে যেমন অরূপরতন আছে সেই সঙ্গে আছে ছয় রিপু–কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, ও মাৎসর্য ইত্যাদি। নির্ভীক পথিক শরণাগতির পরে যদি এগিয়ে যেতে পারে তবে লক্ষ্যে একদিন পৌঁছাবেই। পরম আচার্য বলেন,–বারবার ধাক্কা দাও দরজায়, দরজা একদিন খুলবেই। দরজা খোলবার জন্যই তো তিনি ভেতরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পৃথিবীতে আগমন তো এই ভিতরে টেনে নেবার জন্যই। অফুরন্ত প্রেম, ভালোবাসায় তিনি কানায় কানায় পূর্ণ। ভক্তের চাহিদা অনুযায়ী তিনি প্রেম বিতরণ করেন। ভক্তের অধ্যাত্ম ক্ষুধা উপশমের জন্য তিনি সদাই উন্মুখ। সে ভক্ত যে সব সময়ই বলে চলেছে– 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা, প্রভু তোমার পানে, প্রভু তোমার পানে'। তাকেই তিনি কাছে টেনে নেন। এ যে আপন সন্তানের সাথে সাক্ষাৎ। কিন্তু রাস্তায় যে অনেক খানাখন্দ আছে, পার যে পথিককেই হতে হবে, তিনি শুধু দিক নির্দেশ করিয়ে দেন। ভক্তের চেষ্টা যদি ঐকান্তিক হয়, লক্ষ্যের প্রতি থাকে অটল বিশ্বাস, তবে পথের শেষে দেখা হবেই। ভক্তের যেন প্রতিক্ষণেই সংকল্প হয় 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো'। প্রত্যেক ভক্তের প্রাপ্তি তার নিজস্ব। এইখানে নেই কোনো প্রতিযোগিতা। তিনি বলেন, তিনি কাউকে দেন না, ভক্তের মধ্যে সব থাকে। তিনি কেবল আলো জ্বেলে দেন, যাতে পথিক পথ চিনে নিতে পারে। শ্রাবণের ধারার মতো তাঁর আশীর্বাদ। তাঁর আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে ভক্তপ্রাণে, কিন্তু সেই ধারাকে যে যত প্রেম ভক্তি ভালোবাসায় ধরে রাখতে পারে সে তত এগিয়ে যেতে পারবে। প্রসন্নচিত্তে ঈশ্বর যেন দেখতে পারেন –তাঁর আগমন ব্যর্থ হবার নয়, সব চারা থেকে গাছ বেড়ে না উঠলেও অবশ্যই কিছু চারা মহীরূহে পরিণত হবেই। তখনই তাঁর আগমন সার্থক হয়ে উঠবে। তিনি তো সেই অঙ্গীকার সফল করতেই ধরায় নেমে আসেন।

অভীঃ মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হও। সাহস ও দৃঢ়তার সাথে প্রতিটি কাজ করে যেতে হবে।

— শ্রী শ্রী প্রভুজী

চরণাশ্রিত
সুলতা সরকার
রবীন্দ্রপল্লী, অমরকানন, বাঁকুড়া

তোমারই দেওয়া প্রাণে, তোমারই অনুভব

ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য

যুগে যুগে এ পৃথিবীতে কতই না মহামানব এসেছেন, কিন্তু তাঁদের সাক্ষাতের সৌভাগ্য ক'জনারই বা হয়েছে ? মানুষ তাঁদের চেনে শাস্ত্রগ্রন্থের পাতা উল্টিয়ে আর অনুভূতির আনন্দে। সেখানে আমার নিজের যে এমন জন্মান্তরের সুকৃতি হবে তাই বা আমি কী জানতাম ? পরমারাধ্য শ্রী শ্রী প্রভুজীর সাথে প্রথম সাক্ষাতের আগে আমার জীবন কাটছিল ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আদর্শানুসরণের প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। সে একধরণের দিন যাপন। তারপর যেদিন প্রভুজীর শ্রীচরণতলে আসতে পারলাম সেদিন থেকে যেন আমার জীবনপট পাল্টে গেল এক নিমেষে। শুধু বিস্মিত হয়ে দেখেছি মহাসাগরের অনন্ত রূপ। জমাটবাঁধা জীবনের দুঃখ বেদনার ঘরে তিনি মুহূর্তের মধ্যে যে এমন আলো জ্বালিয়ে দিতে পারেন তা ছিল কল্পনারও অতীত। ভালোবাসার এক অন্তহীন রাজ্যে তিনি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমরা বিস্ময়ে হতবাক। মহাজীবনের এমন ভালোবাসা বিগলিত অতুলনীয় স্নেহের যে কোনো তুলনা আমি খুঁজে পাই না। প্রথম দিনই তিনি বললেন, "আজ থেকে তোমরা আলোর রাজ্যে প্রবেশ করলে। এখন শুধু আনন্দ। তোমাদের আত্মনিবেদন করতে হবে।" শুরু হল আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

পরমারাধ্য শ্রী শ্রী প্রভুজীর হৃদয়জয়ী ভালোবাসা, তাঁর অনাবিল ব্যক্তিত্ব সর্বোপরি তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় আমাদের অভিভূত করে দিয়েছিল। যত বেশি তাঁর সান্নিধ্যে এসেছি ততই অনুভব করেছি তাঁর আধুনিক চিন্তাধারা। তাই দেখি প্রত্যন্ত পল্লীপ্রান্তরে যেখানে নারীশিক্ষার আলোই যখন পৌঁছায়নি সেখানে তিনি নির্দ্বিধায় প্রতিষ্ঠা করেছেন ইংরেজি মাধ্যমের কনভেন্ট স্কুল। শিক্ষাই জাতির জাগরণের উপায়। তাই গ্রামীণ মেয়েদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, প্রয়োজন মনুষ্যত্ব বোধের মূল্যায়ন। প্রভুজীকে দেখেছি মহান মানবপ্রেমিক রূপে। গ্রামের সমস্ত অবহেলিত, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাছন্ন গ্রামবাসীদের জন্য তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা।

প্রভুজীর সান্নিধ্যে এসে আমরা কী যে পেয়েছি তার মূল্যায়নের দিন আজ সত্যিই এসেছে । আগের মতন দর্শন হয়তো আজ আর হয় না কিন্তু তাঁর স্মরণ আর মননের মধ্যে দিয়েই আমরা দিনযাপন করে চলেছি। আপ্তকাম মহাযোগী আজ তাঁর গভীর সাধনায় নিমগ্ন। এই সাধনা তিনি তো এ পৃথিবীর লোককল্যাণের জন্য করে চলেছেন। বিশ্বের চতুর্দিকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা। এক নিরীশ্বরবাদী ভাবনায় মূল্যবোধ হারিয়ে যেতে বসেছে। এক দেশ অন্য দেশকে যুদ্ধের হুংকার দিচ্ছে। এক আগ্রাসী নীতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। হারিয়ে যাচ্ছে মানবতাবোধ, বিবেকবোধ। মানুষ আজ আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে উঠেছে যা তার জীবনকেই শেষ পর্যন্ত করে তুলেছে অস্থির, অসহায়। যে কোনো আঘাতে সে হয়ে পড়ছে অসহায়। এই গড্ডালিকা প্রবাহ তো চলতে দেওয়া যায় না। তাই আমাদের হৃত সম্পদকে পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রভুজীর মাঙ্গলিক উপস্থিতি সমস্ত জগৎসংসারের জন্যই হিতকর। শ্রী শ্রী প্রভুজীর আশীর্বাদ তাই তাঁর ভক্তপ্রাণ অনুরাগীদের মধ্যে নিত্য বর্ষিত হচ্ছে। এখানে গৃহী বা সন্ন্যাসীর কোনো পার্থক্য নেই। এই মহান কর্মযজ্ঞে সবাই যোগদান করতে পারে। যার যা সামর্থ্য আছে সে সেইভাবে সাহায্য করব। আমরা যারা সংসারী মানুষ সীমাবদ্ধ জীবনের চাওয়াপাওয়াগুলির মধ্যে যেন আটকা না পড়ে থাকি, তার জন্য প্রভুজী আমাদের কম সাহায্য করেননি। তাঁর দিব্য সান্নিধ্য দান করে আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন শরণাগতির আনন্দ। কারণ শরণাগত জীবনই বাস্তবতাকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম। বাস্তবতা প্রতিকূলতাকে ভয় পায় না। ভয়হীন চিত্তের উন্নত শিরকে তাই তিনি ভালোবাসেন। তাই একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'ঝড় আমার খুব ভালো লাগে। ঝড়ের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। ঝড়ও এক গুরু। এই ঝড়ে কেমন সব ডালপালা নুয়ে যায়, কিন্তু ভাঙে না। ভেঙে পড়লেই জঞ্জাল মনে করে সরিয়ে ফেলার জন্য লোক তৈরি হয়েই আছে। ঠিক সেরকমই সাধকের জীবনেও প্রচণ্ড ঝড় আসে। আবার এখন যে রকম আকাশ শান্ত, পরিষ্কার, সে রকম শান্ত হয়ে যায়। ঝড় উঠলে তখন শক্ত করে খুঁটি ধরে থাকতে হয়। ঝড় তো উঠবেই তার জন্য চিন্তা কী ? খুঁটি ধরে থাকলেই হল'।

বহুদিন প্রভুজী আমাদের কৃপা করে তাঁর দুর্লভ সান্নিধ্য দান করেছেন। তিনি আমাদের কাছে কতরকমভাবেই না তুলে ধরেছেন তাঁর ভাবনা, চিন্তা, স্বপ্ন, আদর্শ। তাই আজ প্রার্থনা, আমার যতটুক দেওয়ার আছে তাই যেন দিয়ে যেতে পারি। প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং ঈশ্বরের সেবা করা কী আর সবার ভাগ্যে হয় ? তিনি তো সব কিছুর মাঝেই আছেন কিন্তু মানুষের চেতনায় তিনি বিরাজ করছেন বলেই আমরা তাঁকে অনুভব করতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে, নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করতে হবে। আমিত্ববোধ যত ত্যাগ করতে পারবো ততই আমাদের হৃদয় নির্মল আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠতে পারবে।

পরমারাধ্য প্রভুজী আমাদের আনন্দময় দেবতা। আমরা এই আনন্দসত্ত্বা নিয়ে প্রভুজীর চরণতলে স্থান পাবো। তবেই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন একটা সময় আসবে যখন সেই বৃন্দাবনের সুর শুনতে পাবো। তিনি যে ডাক দিয়ে চলেছেন জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে। তিনি বলছেন, হে অমৃতের সন্তান তোমরা এসো, এসো, আমি তোমাদের জন্যই ডাক দিয়ে চলেছি।

চোখ বুজে ভেতরপানে তাকাও

শৈলেন চক্রবর্তী

প্রণাম করার সময় চোখ বুজে আসে। নিবিষ্ট হওয়ার যে কোনো পরিস্থিতিতে চোখ বুজে আসে। গানের সুরে ডুবে গেলে কখন যেন চোখ বুজে ফেলি। চোখ বুজি মন শান্ত থাকলে। মাঝে মাঝে চোখ বুজলে চোখের আরাম, প্রাণেরও আরাম। অন্তর্মুখী হওয়ার প্রথম ধাপই হল চোখ বুজতে হবে। চোখ বুজলে অন্তর্মুখী, চেয়ে থাকলে বহির্মুখী। চোখ না বুজলে অন্তরকে দেখা যায় না। গভীর চিন্তনে চোখ বুজে আসে আপনাআপনি।

চোখ বোজার এমন যে মহিমা, আগে কি কখনও খেয়াল করেছি ? প্রভুজী বারবার বলেন, ভেতরপানে তাকাও। চেনো তোমার আপন অন্তরকে। প্রভুজী আমাদের মনে করিয়ে দেন, 'আমি দেহ নই, আমি আত্মা'।

বাইরের দৃষ্টিতে আমরা কেবল দেহকে দেখি, চোখ না বুজলে আত্মাকে অনুভব করব কেমন করে। তবে যে বাইরের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ রাখার জন্যই আমাদের যত হাঁকপাঁক। চোখের ডাক্তারবাবু কেবল বাইরের দৃষ্টিকে সামলে দেন। চশমা এঁটে ঝকঝকে দেখতে পেলে বেশ তৃপ্তি। কিন্তু অন্তরের দৃষ্টি নিয়ে আমরা সচেতন কতটুকু? গুরুজি বলেন, চোখ বুজে দেখো। আমরা ভাবি, সেটা আবার কীরকম। চোখ বুজে দেখা যায় নাকি !

প্রভুজী বলছেন, ভেতরপানে তাকাও। আমরা টর্চ জ্বেলে ঘরের ভেতরখান দেখছি সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। নিজের ভেতরপানে তাকানোর নির্দেশ সহজে বুঝতেই পারি না। তিনি ডাক দিচ্ছেন ভেতরপানে, আমরা তাকিয়ে রয়েছি বাইরের জগতে।

ঈশ্বর কিংবা প্রকৃতি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে আপন বৈশিষ্ট্যে গড়ে তুলেছেন। প্রতিটি জীবের গঠন, চলনবলন, জীবনযাপন আলাদা। মৌমাছির সঙ্গে প্রজাপতি মেলে না, আমগাছ আর জামগাছও আলাদা। কোটি কোটি বছর ধরে কাশ আর ঘাসের পৃথক অস্তিত্ব। মানুষও প্রকৃতির সৃষ্টি। মানুষের জন্যও আছে প্রকৃতির নির্দিষ্ট নিয়মকানুন। কিন্তু মানুষ যে নিয়মের ধার ধারে না। মানুষ তার আপন নিয়ম তৈরি করে। দেশে দেশে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে নিয়ম আলাদা। প্রকৃতির যাবতীয় নিয়মকানুন মানুষ কেবলই তছনছ করে, আর সম্ভবত মানুষের দুর্ভোগই সবচেয়ে বেশি।

মানুষ প্রকৃতির সবচেয়ে উন্নত জীব। কিন্তু মানুষের জীবনই সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খায়। মানুষ বিড়ম্বিত হয় বিপর্যস্ত হয়। মানুষেরই সবচেয়ে বেশি অসুখ করে। মানুষই কেঁদে আকুল হয়। মানুষের দুঃখই কি সবচেয়ে বেশি ? কেন , ভেবেছি কখনও?

প্রকৃতির আর কেউ নয়, কেবল মানুষই সর্বভূক। অথচ নখ, দাঁত, পাকস্থলী, পাচনপ্রণালী অনুযায়ী মানুষের শাকাহারী হওয়ার কথা ছিল। মানুষ মানেনি। মানুষ অন্ধকারে দেখতে পায় না, অথচ মানুষই হয়েছে নিশাচর। আপন বুদ্ধিবলে অন্ধকারকেই হঠাতে চেয়েছে। হায়রে, বাইরের অন্ধকার সরিয়ে আপন অন্তরে অন্ধকারের খনি তৈরি করেছে। অন্ধ মানুষ প্রকৃতিজাত আপন বৈশিষ্ট্যকে চিনতেই চাইল না।

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কর্মমুখর সময়। তারও আগে ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রস্তুতি নাও, নতুন একটি দিনের জন্য নিজেকে জাগাও। আর সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যায় নিবিষ্ট হও চিন্তনে। চোখ বোজো। ধ্যানস্থ হও, নিবিষ্ট হও, প্রার্থনায় শান্ত হও। চিনতে চেষ্টা করো আপন মনের প্রশান্তি। চলো এবার বিশ্রামে। প্রতিটি জীবের জন্য রয়েছে নির্ধারিত বিশ্রামক্ষণ। একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা নিরীহ গাছটিও জানে, সূর্যাস্তের পর সালোকসংশ্লেষ চলে না। আগামীকালের জন্য আজকে রাতের বিশ্রামটুকু বড়ো প্রয়োজন। গাছ বোঝে, মানুষ বোঝে না !

সারাদিন নির্ধারিত সময়ের পরেও মানুষের ধান্দা শেষ হয় না। যত অগ্রগতি, তত রাত জাগা । গ্রামে তবুও আলো নেভে একটু তাড়াতাড়ি, শহর জেগে থাকে রাতভর। কত কাজ আমাদের। জেগে থাকতে হবে না! আমাদের কি চোখ বোজার সময় আছে ?

মানুষের সভ্যতা যত এগোচ্ছে, মানুষের দুচোখ বোজার অবকাশ তত কমছে। আর মানুষ যত বেশি তাকিয়ে থাকছে, তার মানসিক অস্থিরতা তত বাড়ছে। মনে মনে মানুষ বেশি অশান্ত হচ্ছে। মন অশান্ত হলে অশান্তি বাড়ে। অশান্তি থেকে বিরক্তি উত্তেজনা রাগ এবং তলিয়ে যাওয়ার পরপর সম্ভাবনা তৈরি হয়। অগ্রগতির এই দুনিয়ায় মানুষের হাতাশা বাড়ছে, আত্মহত্যার প্রবণতাও বাড়ছে। মানুষের মতো প্রকৃতির আর কোনো জীব এভাবে আত্মহত্যা করে না।

খেয়াল করো, তুমি যখন দুশ্চিন্তায় রয়েছ কিংবা মনে মনে পাঁয়তারা কষছ তখন দুচোখ তাকিয়ে আছে। চোখ বুজে বাজে চিন্তা করার চেষ্টা করো, পারবে না। অথচ তুমি যখন সুচিন্তনে রয়েছ, তোমার দু-চোখ বুজে আসবে। চোখ বুজলেই মন শান্ত হয়ে আসে। বলা ভালো, মন শান্ত থাকলেই চোখ বোজা সম্ভব।

ঢুলুঢুলু চোখ, শিবনেত্র-এ তো যোগীর লক্ষণ। ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত যোগীরাজ চোখ বুজেই বিশ্বদর্শন করছেন। দুচোখ চেয়ে সামনের নির্দিষ্ট দুরত্ব পর্যন্ত দেখা যায়। আর চোখ বন্ধ করে সীমাহীন দূরত্ব দেখা সম্ভব। দুচোখ চেয়ে শুধু বর্তমানকে দেখা যায়। চোখ বন্ধ করে অতীত ও ভবিষ্যৎও দেখা যায়। ধ্যানমগ্ন যোগীই তো ত্রিকালদর্শী।

করোনায় লকডাউনের সময় কাজকর্ম বেশ থমকে আছে। তাই বলে কি বাইরের দর্শন কমিয়ে অন্তর্দর্শন বেড়েছে? না, বরং বাইরের দর্শন আরও বেড়েছে। এখন সময় অসময় সবসময় 'অনস্ক্রিন'। অগ্রগতির দুনিয়া এখন অনলাইনে। অফিস থেকে স্কুল সব অনলাইন। আর সোশ্যাল মিডিয়ার আনসোস্যাল গসিপিং চ্যাটিং ফরোয়ার্ডিং তো আছেই। এখন আমাদের সবজান্তা তথ্যভান্ডার গুগুলের উইকিপিডিয়া, হাতে গরম রেসিপি বা বিনোদনের ভাঁড়ার ইউটিউব। দেখো দেখো আর দেখো। প্রতি সেকেন্ডে নিজিকে আপডেট করো, নাহলে পিছিয়ে পড়বে যে। কেবল কাউন্ট করো লাইক শেয়ার ভিউয়ার। ওই হল তোমার টিআরপি । সারাদিনে হোয়াটস্‌অ্যাপে কত ম্যাসেজ গেলো আর কত মেসেজ গেলাও, খেয়াল আছে ? যদি বলি, মোবাইলটা সরিয়ে রেখে একটুখানি স্থির হয়ে চোখ বুজে বসো তো। ধুস কী যে বলেন। সব ছাড়তে পারব, অনলাইন থেকে অফলাইন হতে পারব না। নেটওয়ার্ক দুর্বল থাকলে পেট গুড়গুড় করে, খেতে পারি না। ছোটোবেলায় পড়েছিলাম জলই জীবন। এখন মনে হয় মোবাইলই জীবন।

বেশ, তবে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকো। শুধু মোবাইল তো নয়, আছে টিভিও। আছে 'হলুদ' খবর, আমাদের ছেড়ে কোথাও যাবেন না 'ব্রেকিং নিউজ', 'সিরিয়াস' সিরিয়াল এবং বিজ্ঞাপন। গেলো গেলো গেলো এবং ঢেকুর তোলো। যাক বাবা আনলিমিটেড কলে কথা বলার একটা বিষয় পাওয়া গেল। ভাগ্যিস খবরে দেখাল, নাহলে কী নিয়ে সারাদিন কথা বলতাম ! হ্যালো। দেখলে কী সাংঘাতিক অবস্থা। এইমাত্র খবরে দেখাল।

হ্যাঁ গো, আমাদের টিভিতেও দেখাচ্ছে।

আমাদের টিভি, আমোদের টিভি। দেখো দেখো দেখো ! যত দেখবে তত ব্যাবসা।

মানে? এখানে আবার ব্যাবসা এল কোথা থেকে ? অনলাইনে সোস্যালমিডিয়ায় কিংবা টিভির মিডিয়া কেউই কিন্তু চ্যারিটি করতে বসেনি। সবাই ব্যাবসা করতে নেমেছে। তুমি যত তাকিয়ে থাকবে, যত ড্যাবড্যাবিয়ে গিলবে তত ব্যাবসা বাড়বে । যত তাকিয়ে থাকবে কোং-এর মুনাফা তত বাড়বে। অনস্ক্রিনে তোমাকে তাকিয়ে থাকানোর জন্য সংবাদে যত 'হলুদ' মেশাতে হয়, মেশানো হবে। কারণ 'সংবাদ' পরিবেশন তো লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল 'মুনাফা'। সিরিয়াল দেখে তুমি যত কাঁদবে, প্রোডিওসারের মুনাফা তত বাড়বে। তুমি মাস্ক পরে কাঁদবে বলে পৌঁনে দুশো বছর আগেকার ইতিহাসের মুখেও 'মাস্ক' লাগিয়ে সিরিয়াল হচ্ছে। লক্ষ্য একটাই, তুমি তাকিয়ে থাকো। তুমি তাকিয়ে থাকলে 'চেন বিজনেস' বাড়বে। বিজনেস বাড়লে লাইনে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েগুলোর উপার্জন বাড়বে।

এই উপার্জনই সভ্যজীবনের মূল লক্ষ্য। 'অর্জন' নয় কিন্তু, মুখ্য হল 'উপার্জন'। জ্ঞান

শেষাংশ ৬পৃষ্ঠায়

মাঘোৎসবে শিউলিবনায় ধরতিবাবা

শ্রী হিমাদ্রী

২৮ শে মাঘ, ইংরেজি ১২ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার সন্ধ্যা ৬.৪০ মিনিটে পরম আরাধ্য শ্রী শ্রী প্রভুজী শিউলিবনার উদ্দেশ্য রওনা দিলেন।

পবিত্র মাঘ মাস প্রভুজীর আবির্ভাবের মাস। এই উপলক্ষে শিউলিবনা গ্রামে আবির্ভাব তিথির পালনের আয়োজন করা হয়েছিল।

গ্রামবাসীদের আকুল আহ্বানে শিউলিবনা যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। সন্ধ্যা ৬.৪০ মিনিটে গীতা আশ্রম থেকে প্রভুজীর গাড়ি শিউলিবনার উদ্দেশ্য রওনা দিল। রণবহাল গ্রাম পেরিয়ে গাড়ি চলল অন্ধকারে। নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে তাঁর যাবার খবর আগে থেকেই ছিল, তাই তাঁর দর্শনপিপাসুরা রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি যখন সেই গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছে তখন তারা করজোড়ে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছে। এরপর কেশিয়াড়া, গোয়ালডাঙ্গা, উখড়াডিহি পেরিয়ে গাড়ি পৌঁছালো জামসোলার মোড়ে। সেখানে কী আশ্চর্য দৃশ্য। রাস্তার দু'পাশে শিউলিবনা গ্রামের পুরুষের দল মশাল হাতে নিয়ে প্রহরীর মতো তাদের ধারতিবাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রভুজীর গাড়ি ওখানে পৌঁছানো মাত্র 'জোহার জোহার ধারতিবাবা' নামে চারিদিক মেতে উঠলো। ওরা মোটরবাইক নিয়ে মশাল জ্বালিয়ে প্রভুজীর গাড়ির সামনে এগিয়ে চলেছে। চারদিক অন্ধকার, শুধু মশালের আগুন সেই অন্ধকারকে ভেদ করে এগিয়ে যাচ্ছে।

এক স্বর্গীয় অনুভূতি। মিনিট দশের মধ্যে গাড়ি পৌঁছালো শিউলিবনা গ্রামের এক প্রান্তে। সেখানেই অপেক্ষা করছিল গ্রামের মানুষেরা। গাড়ি থেকে নামামাত্রই গ্রামের লোক প্রভুজীকে বরণ করতে এগিয়ে এলো। তীর ধনুক টাঙি বল্লম ইত্যাদি নিয়ে তারা তাদের রাজার দেহরক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এরপর প্রভুজী মিলনমেলার দিকে এগিয়ে চললেন। গ্রামের মহিলারা রাস্তার দুপাশে হাতে কাঁসার থালায় ধান, দূর্বা, ধূপ ও প্রদীপ জ্বালিয়ে 'জোহার জোহার ধারতিবাবা' করতে করতে এগিয়ে চললো মিলনমেলার দিকে। গ্রামের ছোট বড়ো স্ত্রী-পুরুষ সবাই এই উৎসবে মেতে উঠেছে। প্রত্যেকটি ঘর নতুন করে সাজানো হয়েছে। মাটির দেওয়ালগুলো ফুল আল্পনা এঁকে সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকটি ঘরের দরজার আল্পনা ও ঘট দেওয়া হয়েছে। যেমন দুর্গাপুজোর উৎসবে নতুন কাপড় পরা হয়, ঘর রং করানো হয়, তেমনি আজ শিউলিবনাতেও উৎসবের আমেজ। 'জোহার জোহার ধারতিবাবা' আর 'প্রভুজী কী জয়' বলতে বলতে গ্রামের মানুষ এগিয়ে চলেছে প্রভুজীর সঙ্গে সঙ্গে । সারা গ্রাম হেঁটে প্রভুজী মিলনমেলায় পৌঁছে আসন গ্রহণ করলেন । তাঁর দর্শন পাবার জন্য সবাই করজোড়ে অপেক্ষা করছিল। প্রভুজীর বসার জন্য গ্রামবাসীরা একটি খড়ের চালা বানিয়েছিল। ফুল, পাতা দিয়ে এই চালাটি সাজানো হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর গ্রামের পক্ষ থেকে কিছু গান পরিবেশন করা হল। গ্রামের মহিলাদের প্রণাম হয়ে যাবার পর, গ্রামের পুরুষেরা একের পর এক প্রণাম নিবেদন করলো। প্রভুজী এসেছেন তাই গ্রামের মানুষের জন্য ছিল খাবারদাবারের এলাহি ব্যবস্থা। অনেক রকমের সুস্বাস্থ খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল।

এরপর গ্রাম থেকে বিদায় নেবার পালা। সে এক করুণ দৃশ্য। এত আনন্দের পর এলো বিরহের স্রোত। প্রভুজীর গাড়ির পেছনে গ্রামের সবাই মিলে ছুটে চলেছে। যেন এক মুহূর্ত তারা তাদের ধারতিবাবাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। সবাই পাগলের মতো ছুটছে, তারা তাদের প্রভুর প্রেমে পাগলের মতো ছুটছে। রাস্তার ধারে যে মাটির ঘটগুলো রাখা ছিল সেগুলো তাদের পায়ে লেগে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের কোনো হুঁশ নেই, যন্ত্রণা নেই। শুনেছিলাম কৃষ্ণপ্রেমে গোপীরা পাগল হয়ে যেত, তারা কৃষ্ণবিরহ সহ্য করতে পারতো না, আজ স্বচক্ষে তাই দেখছি। গ্রামের শেষ সীমানায় তাদেরকে থামিয়ে দেওয়া হল। জানি না, না থামালে ওরা কতদূর যেত। গাড়ি আবার চললো আশ্রমের দিকে। রাত তখন প্রায় ৯.৩০ হবে। শীতের ঠান্ডাভাব এখনো আছে, তাই সব দোকানপাটও বন্ধ হয়ে গেছে ও গ্রামের লোকও সবাই ঘরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু যারা প্রভুর দর্শনপিপাসু তারা ঠিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। তাই কিছু কিছু জায়গায় গাড়ি থামিয়ে প্রভুজী তাদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং প্রসাদও দিলেন। রাত যখন প্রায় ১০টা, তখন গাড়ি এসে থামলো রণবহাল গ্রামের আত্মদ্বীপ ফাউন্ডেশন-এর গেটের সামনে । তখনো গ্রামের কিছু বাসিন্দা ওখানে অপেক্ষা করছিল। সেখানে ওদের সঙ্গে কিছু কথা বলে প্রভুজী প্রায় ৫৪বছর পর নিজের পায়ে হেঁটে সেই খামারের কাছে গেলেন যেখানে তিনি তাঁর বাল্যকালের বেশির ভাগ সময়টা কাটাতেন। তারপর এক অকল্পনীয় ঘটনা, প্রভুজী প্রবেশ করলেন তাঁর পূর্বাশ্রমে। এ ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীদের জন্য অবিস্মরণীয়। বেলতলা পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে রাত ১০.১০ নাগাদ আশ্রমে প্রবেশ করে উপস্থিত সবাইকে আশীর্বাদ জানিয়ে প্রভুজী বেদান্তকুটিরে চলে গেলেন। শান্ত মৌন সাধনগম্ভীরা যেন তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছিল।

৫-এর পাতার পর

চোখ বুজে ভেতরপানে তাকাও

অর্জন করতে হয়, অর্থ উপার্জন করতে হয়। আধুনিক সভ্য সমাজে অর্জনের চেয়ে উপার্জনের গুরুত্ব বেশি। উপার্জন করতে হলে তাকিয়ে থাকো। চোখ বুজে অর্জন হতে পারে, কিন্তু তাকিয়ে থাকলে তবে উপার্জন।

ভেবে দেখো, তোমার আগ্রহ অর্জনে, নাকি উপার্জনে ? আমরা চাইলেই কি এই সভ্যতার নিয়মকানুন থেকে বেরিয়ে আসতে পারব? না, পারব না। প্রয়োজনও নেই। তবে খানিকটা সংশোধিত হতে তো আপত্তি নেই। চেষ্টা করে দেখো তো, পারা যায় কিনা।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই চোখ বুজে স্মরণ করো প্রভুজীর বাণী 'আমি দেহ নই, আমি আত্মা'। এই নতুন সকালে আমি ঝকঝকে তাজা এক প্রাণ। আমি প্রভুসন্তান, তাই আমি 'চিরশুদ্ধ চিরমুক্ত, চিরআনন্দস্বরূপ'। আমি সারাদিন এমন কোনো কাজ করব না, যাতে আমার শুদ্ধতা নষ্ট হয়। কোনোভাবেই আমি আমার অন্তরের মুক্তি এবং আনন্দকে হারাতে দেব না।

দিনের শেষে আর কাজকে বহন করব না। সন্ধের পরে অল্পসময়ের জন্য হলেও চোখ বুজে চিন্তন করব, ধ্যান করব। মনে মনে সারাদিনের কাজের সমীক্ষণ করব। আমি যেন সব কর্ম তাঁর পায়ে সমর্পণ করতে পারি। কোনো কর্মের জন্য মনের মধ্যে তিলমাত্র গ্লানি জমা হলে, আমি স্বীকার করব আপন ভ্রান্তি-অপরাধ। মনে মনে সংশোধিত হব।

নিশ্চিন্ত প্রশান্ত মনে প্রস্তুত হব বিশ্রামের জন্য। না, সন্ধের পর আর কোনোভাবেই স্ক্রিনে তাকাব না, অনলাইন থাকব না। সন্ধের পর অফলাইন। যতটা পারা যায়। প্রথমে হয়তো অসুবিধা হবে। কিন্তু চেষ্টায় কী না হয়, সবই হয়।

তুমি কি টের পেয়েছ চোখ বুজে শান্ত থাকার মাধুর্য ? আহ, কী প্রশান্তি । চোখ বুজে নিজের ভেতরখানা দেখো। ঘষে মেজে নিজেকে পরিমার্জন করো প্রতিদিন। প্রভুজী বলছেন, ভেতরপানে তাকাও।

চোখ বুজে ভেতরপানে তাকানো- এই কি তবে ধ্যান!

Printed and Published by Anahata on behalf of Shamayita Math and Printed at Shamayita Press, Ranbahal, Amarkanan, Bankura and Published at Shamayita Math, Ranbahal, Amarkanan, Bankura-722133
Ph. No. & Fax- (03241) 265202 **Editor : Anahata, Jt. Editor : Sagnika**